গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর - ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল দিল্লিতে

৯ ডিসেম্বর দিল্লির বুকে আবার আছড়ে পড়ল গবেষক ছাত্রদের আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর লাঠি, জলকামান, টিয়ারগ্যাস নিয়ে পৈশাচিক বর্বরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ। পুলিশের আক্রমণে বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ দেশের সবচেয়ে মেধাবী গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্য একটা মিছিলও হতে দিতে চায় না। নির্মম হাতে তাকে দমন করতেই তারা উদ্যত।

এতদিন পর্যন্ত ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) পাশ সার্টিফিকেট না থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা গবেষণার সুযোগ পেতেন এবং তার জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। সম্প্রতি ইউ জি সি এক ফরমান জারি করে তা বন্ধ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গবেষকরা আন্দোলন করে আসছেন অক্টোবর মাস থেকে। গবেষণায় বরাদ্দ কমানো চলবে না এবং ভারত সরকারকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(ডব্লুটিও)-র সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে হবে— এই দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে গবেষক ছাত্ররা চালিয়ে যাচ্ছেন 'অকুপাই ইউজিসি' আন্দোলন। ৯ ডিসেম্বর সারা দেশ থেকে আগত কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী দিল্লিতে ইউজিসি অফিসার সামনে থেকে সংসদ ভবন অভিমুখে মিছিল শুরু করেন। মাণ্ডি হাউসের সামনে পৌঁছাতেই পুলিশ জলকামান ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায়। কিন্তু ছাত্র মিছিল দৃঢ়তার সঙ্গে পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে গেলে শুরু হয় বর্বর লাঠিচার্জ। পুলিশ নৃশংসভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মারতে থাকে। পুরুষ পুলিশকর্মীরা ছাত্রীদের অশ্লীলভাবে মারে, বহু ছাত্রীর পোশাক এমনকী অন্তর্বাস পর্যন্ত টেনে ছিঁড়ে দেয়। আন্দোলনের অন্যতম নেতা এআইডিএসও-র দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রশান্ত কুমার সহ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখে। পুলিশি আক্রমণে যাঁরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এআইডিএসও-র সোনেপত জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীন নেহরা, সংগঠনের অন্যতম সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ সিং, আশুতোষ সিং যাদব প্রমুখ।

ভারতে যত ছাত্র উচ্চশিক্ষা নেন, তার ১০ শতাংশের কম গবেষণায় সুযোগ পান। তা সত্ত্বেও নেট উত্তীর্ণ নয় এই অজুহাতে গবেষণায় স্কলারশিপ বন্ধ করে দিলে অসংখ্য ছাত্র যাঁরা পিএইচডি বা গবেষণা করছেন তা বন্ধ হয়ে যাবে। একটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানজগতের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতেই আমাদের দেশে দারিদ্র ও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচের জন্য বহু মেধাবী ছাত্র মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মৌলিক গবেষণায় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের অনীহা, পরিকাঠামোর অভাব, গবেষণাকে শিল্পমুখী করার নামে তা শিল্পপতিদের কৃপার উপর ছেড়ে দেওয়ার নীতির ফলে গবেষণার মান একেবারে তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে নানা অজুহাতে গবেষণায় বরাদ্দ ছাঁটাই এই মানকে আরও নামাবে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে শিক্ষাকে ডব্লুটিও-র চুক্তির আওতায় নিয়ে গেছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে সর্বতোভাবে। শিক্ষা হচ্ছে মুনাফার অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র। শিক্ষাবিদ-শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষানুরাগী মানুষ শিক্ষা সংহারের এই নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের যে কণ্ঠ তুলেছেন দিল্লির ছাত্র আন্দোলন তাকে আরও শক্তি দিল।

বিরুদ্ধতা করলেই দেশদ্রোহী, এ কেমন গণতন্ত্র!

দিল্লিতে যুক্ত সভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

৬ ডিসেম্বর দিল্লির মান্ডি হাউস থেকে যন্তরমন্তর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি মিছিল আয়োজিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাকি পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ সহ এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান ও দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড আর কে শর্মা। যন্তরমন্তরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এম)-এর কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই-এর কমরেড ডি রাজা, এস ইউ সি আই (সি)-র কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সিপিআই (এম এল) লিবারেশনের কমরেড কবিতা কৃষ্ণণ এবং অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের কমরেড দেবরাজন। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন,

আমরা ৬ ডিসেম্বর দিনটি আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন রূপেই পালন করি। ১৯৯২ সালের এই দিনেই দেশের একটি ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করেছিল সংঘ পরিবারের নেতৃত্বে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। ভারতের ইতিহাসে এই বেনজির ও চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কাণ্ডটির পরিণামে দেশে সেসময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জঘন্য রূপ দিয়েছিল। কিন্তু আজকের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সেদিনের থেকে আরও বিপজ্জনক।

স্বাধীনতার পর দেশে আমরা অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আরও গুরুতর, এখন সংঘপরিবার-শিবসেনা জোটের বিরুদ্ধে আপনি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না। আপনি যদি তা করার সাহস দেখান, তবে আপনার জীবন ও অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। গণতন্ত্রের বুনিয়াদী শর্ত হল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মত ও অবস্থান

দু'য়ের পাতায় দেখুন

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বেতন কমিশন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জে পি এ-র স্মারকলিপি

সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (জেপিএ) ১ ডিসেম্বর ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিতে বলেছে,

বর্তমান সরকার ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারও পূর্বতন সরকারের মতোই কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। একইভাবে সরকারের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে কর্মচারী প্রতিনিধি হিসাবে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা', 'সামাজিক দায়বদ্ধতা', 'উন্নয়ন' এবং 'সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিচার ও বিবেচনার মধ্যে নিয়ে রাজ্য কমিশনকে তার সুপারিশ পেশ করতে হবে। অতীতে প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং উন্নয়নের নামে যে সমস্ত সুপারিশ এসেছে তার পরিণতিতে আমলাদের ক্ষমতা বেড়েছে, বেড়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্তরে স্তরে সঙ্কীর্ণ দলবাজি। অন্য দিকে কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলন গড়া সহ বিভিন্ন অর্জিত অধিকারের উপর নেমে এসেছে আঘাত। বর্তমান সরকারের চলবার ধারা এবং গণআন্দোলন, ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন ও কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কে ধারাবাহিক বিরূপ মন্তব্য কর্মচারীদের মধ্যে বিচার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্ভাব্য সুপারিশগুলি নিয়ে প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত শব্দবন্ধগুলির আড়ালে ত্বরান্বিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া। লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ খালি রাখা, চুক্তি প্রথায় এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে স্বল্প বেতনে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন একটি নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

ষষ্ঠ রাজ্য বেতন কমিশন সংক্রান্ত রাজ্য অর্থমন্ত্রকের ২৭ নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীকে বেতন কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জেপিএর বক্তব্য, ক) স্থায়ী কাজে ঠিকাদারদের মাধ্যমে কিংবা চুক্তি প্রথায় সরাসরি নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারি সহ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে ও নামে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং চাকুরির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলি নির্ধারণ পে-কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

জেপিএর দাবি, বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুস্পষ্ট ঘোষণা করুন— বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে নিশ্চিতভাবে যথার্থই কার্যকরী হবে। অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বেতন কমিশনের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরকার অবিলম্বে এ সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুক। কর্মচারীরা বেতন (বেসিক ও গ্রেড পে) বার্ষিক বৃদ্ধি এবং ডি এ মিলিয়ে ডিসেম্বর মাসের মোট প্রাপ্তি হিসাবে যা পাবেন তার উপর তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ, মধ্যবর্তী স্তরের কর্মচারীদের ১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ স্তরের কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ অন্তর্বর্তী ভাতা জানুয়ারি মাস থেকে দেওয়া হোক। বকেয়া সমস্ত ডি এ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্য দিন থেকে ডিসেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হোক। সর্বশেষ বক্তব্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনকে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে কমিশনকে তার সুপারিশ পেশ করতে হবে।

৬ ডিসেম্বর মিছিল ও সভা

একের পাতার পর

নিয়ে প্রচার, আলোচনা, বিতর্ক ও সমালোচনা। কিন্তু আজ ঘটছে ঠিক বিপরীত! ওইসব দলগুলির অভিমত মেনে নিতে আপনাকে বাধ্য করা হচ্ছে, এবং তা না করলেই আপনাকে দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হবে ও আপনি ওদের আক্রমণের টার্গেট হয়ে যাবেন। এ কীরকম গণতন্ত্র?

বিজেপি যেদিন থেকে সরকারে বসেছে, একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ দেশে তৈরি করা হচ্ছে। 'ঘরে ফেরা' নাম দিয়ে একটি আক্রমণাত্মক আন্দোলন শুরু করা হল শুধুমাত্র মুসলমানদের হিন্দুত্বে ধর্মান্তর করানোর জন্যই নয়, এমনকী খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও এ কাজ করা হল। কাদের করা হল? যাদের পূর্বপুরুষরা হাজার বছরেরও বেশি মুসলিম শাসনে ও দু'শো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কালে ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আজ যাদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে তারা বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে মুসলমান ও খ্রিস্টান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমরা তাদের জোর করে হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত করাচ্ছ, যেটা পুরোপুরি একটা সামন্তী আচরণ এবং গণতন্ত্রের মূল নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ গণতন্ত্র ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। ওরা গণতন্ত্রের কথা বলে, এই কী গণতন্ত্র?

গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হল ও ভোটে তার ফায়দা তোলা হল। দিল্লি নির্বাচনের আগে বিশেষভাবে গির্জাগুলিকে আক্রমণের টার্গেট করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করা হল। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গরুর মাংস খাওয়ার গুজব ছড়িয়ে মহম্মদ আখলাখকে পিটিয়ে হত্যা করা হল, তার পুত্র গুরুতর আহত হল। কিছুদিন পর হিমাচল প্রদেশে অপর একব্যক্তিকে হত্যা করা হল।

একথা ঠিক নয় যে, শুধু মুসলিম বা খ্রিস্টানরাই আক্রান্ত হচ্ছেন। এমনকী দাভোলকর, পানসারে ও অধ্যাপক কালবার্গির মতো 'হিন্দু'দেরও হত্যা করা হচ্ছে। তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল, তাঁরা যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন। এই সকল ঘটনা আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, ইতিহাসবিদ, এমনকী দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশের প্রতিবাদ করা জরুরি মনে করেছেন। নিজেদের পাওয়া পুরস্কারও তাঁরা প্রতিবাদস্বরূপ ফেরত দিয়েছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এ জিনিস ঘটেনি। এই ঘটনা পরিস্থিতির গুরুতর চরিত্রও বুঝিয়ে দেয়। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, দেশকে ফ্যাসিবাদ গ্রাস করতে যাচ্ছে, কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এভাবেই ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল। দেশের শাসকদলই যদি প্রত্যক্ষভাবে, না হয় তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের দিয়ে দেশে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি করে, তবে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর দ্বারা, অন্ধবিশ্বাসজাত উগ্র ধর্মীয় গোঁড়ামি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত। চিত্রাভিনেতা আমির খান কেবল এই অসহিষ্ণু পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার, পরিস্থিতির গুরুতর দিকের প্রতি নজর না দিয়ে উল্টে আমির খানের উপর এই অপবাদ চাপিয়ে দিল যে, তিনি বিশ্বের চোখে ভারতের মর্যাদাহানি করেছেন। এইভাবে সরকার পরিস্থিতিকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ না নিয়ে, গণতন্ত্র রক্ষায় উদ্যোগী না হয়ে কুৎসা প্রচারেই মদত দিল।

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেকুলারিজমের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে বললেন, তা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, তা হবে পথ নিরপেক্ষতা। যার অর্থ হচ্ছে, রাজনীতি, শিক্ষা ও সরকার পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা আছে। এ হল ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পরিষ্কার বিকৃতি। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে ইউরোপের নবজাগরণ আন্দোলন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভব। ধর্মের শক্তির উপর স্থাপিত সামন্তী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেই একটি ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে। শাসন পরিচালনার পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা, যাকে আমরা আজ বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলি, তা সামন্তী রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামন্তী ব্যবস্থায় রাজাকেই ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হত। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন কোনও ধর্মকেই উৎসাহ দেয় না, তেমনই ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপও করে না, ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় গণ্য করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে সমান দৃষ্টিতে বিচার করে।

শ্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, সেকুলারিজম-এর ধারনার উদ্ভব যেহেতু ইউরোপে ঘটেছে, তাই ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তিনি ভুলে যাচ্ছেন— যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নামে তিনি দিন-রাত শপথ নেন সেটারও জন্ম হয়েছিল ইউরোপে। এই ধরনের বিকৃত ব্যাখ্যা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। এসব বিষয়গুলি আমাদের বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করা দরকার!

বর্তমান পরিস্থিতির একটি দিক আমি আপনাদের সামনে রাখলাম। অপর দিকটি হচ্ছে, পুঁজিবাদ এখন গভীরতম সঙ্কটে। এই সংকটের যারা কারিগর, সেই পুঁজিপতিশ্রেণির পূর্ণ সেবায় বর্তমান সরকার নিযুক্ত। ফলে, সরকার সঙ্কটের সমস্ত বোঝাটা দেশের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই জনগণের মোহভঙ্গ হচ্ছে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ জমেছে। দিল্লি, বিহারের বিধানসভা নির্বাচন, উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত ও গুজরাটের পুরনির্বাচনের ফলাফল জনগণের ক্ষোভেরই ইঙ্গিত দেয়। জনগণের এই ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেওয়া দরকার। স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত আন্দোলন সর্বদা ক্ষণস্থায়ী হয় এবং ফেটে পড়ার পরই শেষ হয়ে যায়।

আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য, জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের চর্চা শুরু করানোর জন্য এবং শেষপর্যন্ত এই ব্যবস্থাকেই বদলাবার পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমরা ৬টি বামপন্থী দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি একত্রিত হয়েছি। আপনারা সকলে এই আন্দোলনে যোগ দিন। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আমি দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আবেদন জানাচ্ছি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া উত্তর লোকাল কমিটির অন্তর্গত স্বরূপপুর গ্রামের কর্মী কমরেড এরসাদ আলি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২৩ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ৮০-র দশকের প্রথমদিকে এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে দলের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে যুক্ত হন। তাঁর পরিবারের সমস্ত লোকজন সেই সময় কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। কমরেড এরসাদ আলি দলের কাজ শুরু করলে তাঁর পরিবার সহ নানা গোষ্ঠীর মানুষের থেকে তাঁর ওপর প্রবল চাপ আসে। সেসব অগ্রাহ্য করে তিনি বিপ্লবী আদর্শের টানে পূর্ণ উদ্যমে দলের কাজ শুরু করেন।

কিছু দিনের মধ্যে তিনি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। প্রায় দশ বছর তিনি বাড়ির বাইরে থেকে একটি এলাকায় পার্টির দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর এই কঠিন অনমনীয় সংগ্রাম দেখে তার পরিবারের সদস্যরা ধীরে ধীরে দলের সমর্থকে পরিণত হন।

১৫ নভেম্বর স্বরূপপুর গ্রামে লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মদন সরকার কমরেড এরসাদ আলির জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল ঘোষও বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন লোকাল সম্পাদক, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বকুল খন্দকার। সভা পরিচালনা করেন কমরেড গোলাম মোস্তাফা।

কমরেড এরসাদ আলি লাল সেলাম

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আবাদ ভগবানপুর অঞ্চলের রঘুদেবপুর গ্রামের দীর্ঘ দিনের চাষি আন্দোলনের কর্মী কমরেড পীযূষকান্তি সরদার ৮ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই কমরেডের অকালমৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ এবং দলের লোকজন সমবেত হয়ে বৈপ্লবিক মর্যদায় তাকে শেষ বিদায় দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর রঘুদেবপুর গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড পীযূষকান্তি সরদার লাল সেলাম

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আবাদ ভগবানপুর অঞ্চলের রঘুদেবপুর গ্রামের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের একনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড হৃষিকেশ হালদার ১২ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর।

বিগত সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতি বিশেষত প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে প্রয়াত কমরেড অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। দলের শিক্ষা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ সমর্থন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর শেষ বছর পর্যন্ত প্রতিবারে বৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের নিজগৃহে নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের পঠন-পাঠন তিনিই করাতেন। তাঁর অত্যন্ত বিনম্র ব্যবহার এবং আদর্শনিষ্ঠা দলের কর্মী-সমর্থকদের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁর অকালমৃত্যুতে দলমত নির্বিশেষে মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

কমরেড হৃষিকেশ হালদার লাল সেলাম

পুচ্ছ খসল আপ-এরও
বিধায়কদের বেতন বাড়াল ৪০০ শতাংশ

গল্পে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক কিংবা নীলবর্ণ শিয়ালের কথা শোনা গিয়েছিল। তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেতে দেরি হয়নি এবং পরিণতির কথাও সবার জানা আছে। রাজনীতিতেও এমন ছদ্মবেশী কাক-শিয়ালের অভাব নেই। তাদেরই নতুনতম প্রতিনিধিরা আম-আদমির নামাবলি গায়ে চড়িয়েছিল। অতীতে এমন অনেকের ঝলমলে পোশাকে কারও নাম লেখা ছিল জনতা, কারও ভারতীয় জনতা, কেউ নাম নিয়েছিল সমাজবাদী তো কেউ দলিতবাদী। ধরা সকলেই পড়েছে। এবার আম-আদমিও ধরা পড়ে গেল। বাস্তবের আম-আদমিরা যখন তীব্র মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারির সংকটে পড়ে ছটফট করছে তখন স্বঘোষিত এই আম-আদমির প্রতিনিধিরা অনায়াসে তাঁদের বিধায়কদের বেতন মাসিক ৮৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে নিল।

কয়েক বছর আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে রাজনীতির অঙ্গনে আম-আদমি নাম নিয়ে ঢুকেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। তার আগে প্রবীণ আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনে কিছুদিন অংশ নিয়েছিলেন অরবিন্দ। প্রচারমাধ্যমের দৌলতে মানুষের চেনা-মুখ ছিলেন তিনি। নিরুপায় সাধারণ মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতায় খানিকটা আশান্বিত হয়ে পড়েছিল। বিজেপি এবং কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষ বিকল্প ভেবে দু'হাত তুলে সমর্থন করেছিল কেজরিওয়াল এবং তাঁর আম-আদমি পার্টিকে। রাজ্যে রাজ্যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল আম-আদমির সদস্য হওয়ার জন্য। কলকাতাতেও মোড়ে মোড়ে টেবিল পেতে চলছিল সদস্য সংগ্রহ। তখনই আমরা বলেছিলাম, আম-আদমি কংগ্রেস-বিজেপির বিকল্প নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলাও এ দলের কম্ম নয়। নতুন দল তৈরি হল, অথচ কোনও নীতি ঘোষিত হল না। নীতি নেই, আদর্শ নেই, এমন একটি দল কখনও সমাজব্যবস্থার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করার কিছুদিনের মধ্যেই কেজরিওয়াল প্রথম সারির শিল্পপতিদের সংগঠন সি আই আইয়ের সভায় বললেন, "আমি দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজির বিরোধী, কিন্তু পুঁজিবাদের বিরোধী নই।" তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দলের নামটা আম-আদমি হলেও আসলে এটি আর পাঁচটি আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দলের মতোই একটি দল। না হলে এ কথা আজ প্রায় সকলেই জানে, দুর্নীতিমুক্ত পুঁজিবাদ বলে আজ আর কিছু হয় না। দুর্নীতি আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যার খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান আছে সেই জানে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণাই পুঁজিবাদের ধর্ম। পুঁজিবাদী এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই প্রতি মুহূর্তে দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ ছাড়া তো ক্ষমতার মসনদে বসা যায় না! তাই কেজরিওয়ালকে বলতে হয়েছিল তিনি পুঁজিবাদের বিরোধী নন। লক্ষ করার বিষয়, কর্পোরেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম দিককার হুঙ্কারও এখন আর শোনা যায় না।

সরকারে বসার ১০ মাসের মধ্যেই আম-আদমি নামধারী কাকের শেষ ময়ূরপুচ্ছটিও খসে পড়ল বিধায়কদের মাসিক বেতন ৪০০ শতাংশ বাড়িয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে। বিধায়কদের মূল বেতন ১২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার করার জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। নানা ভাতা মিলিয়ে এই বিধায়করা এখন পান মাসে ৮৮ হাজার টাকা। সেটাই বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন পেলে দিল্লির বিধায়করাই হবেন দেশের সবচেয়ে ধনী বিধায়ক। হঠাৎ এতখানি বেতন বাড়ানোর প্রয়োজন কী পড়ল? আম-আদমির বিধায়করা জানিয়েছেন, এত অল্প অর্থে মানুষের সেবা করতে নাকি অসুবিধা হচ্ছে। অর্থের অভাবে নাকি তাঁরা দর্শনার্থীদের চা-টুকুও খাওয়াতে পারছেন না! শুধু নিজেদেরটিই নয়, 'প্রধানমন্ত্রীর বেতনও প্রয়োজনে বাড়ানো হোক'— বলে কেজরিওয়াল সাহেব দলভারী করতে চেয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে সমালোচনা প্রকাশ পেতেই ক্ষুব্ধ কেজরিওয়াল বলেছেন, "এই হারে বেতন বাড়লেও, যে কোনও সংবাদমাধ্যমের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী যা আয় করেন, তার থেকে ১২০ গুণ কম আয় করবেন দিল্লির বিধায়করা।" যেন কতবড় ত্যাগ স্বীকার করছেন আম-আদমির বিধায়করা! তাঁদের একবারও মনে হল না, এই দিল্লিতেই হাজার হাজার মানুষ শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নিচে বাস করতে বাধ্য হয় এবং তাঁদের অনেকেই ঠাণ্ডায় প্রাণ হারায়। দিল্লিতে একটা বিরাট অংশের মানুষ বস্তিতে অমানুষের মতো বাস করে, তাঁদের বেশির ভাগেরই কোনও স্থায়ী কাজ নেই, ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন কাটায়। কেজরিওয়ালরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে বেতনটা বাড়িয়ে নিলেন তা তো মেটাবে এই অর্ধভুক্ত অভুক্ত প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকা মানুষগুলিই। এদেরই তো তাঁরা আম-আদমি বলেন। তাঁরা তো নিজেদের এই মানুষগুলিরই প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছিলেন। আজ যখন নিজেদের বেতন বাড়ানোর প্রশ্নটি দেখা দিল, নিজেদের আরাম-আয়াসের প্রশ্ন উঠল, তখন আর তাঁরা নিজেদের লোভ সামলাতে পারলেন না। এ তো আম-আদমির সাথে স্পষ্ট প্রতারণা। উঁচু বেতনের প্রতি যাঁদের এতই লোভ, তাঁরা তো তেমন কাজই করতে পারতেন, রাজনীতিতে এলেন কেন? কেজরিওয়ালের এই উদাহরণ দেওয়া থেকেই তাঁর দলটির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। দলটি আসলে সমাজের কোন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায়। বোঝা যায়, বিধানসভায় তাঁরা কাদের কথা তুলে ধরবেন, কাদের হয়ে লড়াই করবেন আর কাদের পক্ষে আইন পাশ করবেন!

কয়েক বছর আগেই সাংসদরা তাঁদের বেতন ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮০ হাজার করে নিয়েছেন। সাথে আছে অন্যান্য ভাতা ও নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা। আজ সেই সাংসদদের অনেকেই আবার কেজরিওয়ালের সুরে সুর মিলিয়ে আরও বেতন বাড়ানোর দাবি তুলছেন। এই দাবিতে দলের নামে, পতাকার রঙে কোনও ফারাক নেই। আত্মসেবায় সকলের এক সুর। গত লোকসভায় যখন সব দলের সাংসদরা একসুরে বেতন বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করছিলেন, তখন ব্যতিক্রম হিসেবে ছিলেন একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাংসদ। তিনি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আমরা যে দেশবাসীর প্রতিনিধি, তাদের বিরাট এক অংশ অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায়, অশিক্ষায় ডুবে থাকে, বিনা চিকিৎসায় মরে, ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করে, লক-আউটে কাজ হারিয়ে সপরিবারে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাদের এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে আমরা আমাদের বেতন বাড়াতে পারি না। আমাদের উচিত নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে এদের দুরবস্থা দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া।' একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও যতবারই বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব এসেছে তার প্রতিবাদ করেছেন একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) বিধায়করাই। দুঃখের কথা, তাঁদের সমর্থনে অন্যান্য দলের একজনও সাংসদ বা বিধায়ক এগিয়ে আসেননি।

এই যে দেশের মানুষ একটা দলের জনবিরোধী ভূমিকাতে ক্ষিপ্ত হয়ে আর একটা দলকে ক্ষমতায় বসাচ্ছে, আবার সেই দলটাও একইভাবে আগের দলের মতোই একই ভূমিকা নিচ্ছে, বারে বারে এমনটা ঘটছে কেন? ঘটছে এই কারণে যে, মানুষ একটা দলকে নির্বাচিত করে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার আগে ভালো ভাবে সেই দলটাকে বিচার করে না। বিচার করে দেখে না সেই দলটা কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল, দলটার নীতি কী, দলের নেতাদের চরিত্র কী, দলটা গড়ে ওঠার ইতিহাস কী, দল চালানোর খরচ কারা জোগায় প্রভৃতি বিষয়গুলি। শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজে সমস্ত জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী দল বলে কিছু হয় না, শাসক অথবা শোষিত, কোনও একটি বিশেষ শ্রেণির স্বার্থই তা রক্ষা করে। এটা পরিষ্কার করে বুঝলে শুধু নেতাদের বক্তৃতায়, সংবাদমাধ্যমের প্রচারে মানুষ বারবার ভুলত না। অনায়াসেই বুঝতে পারত, দলগুলির নাম আলাদা হলেও, পতাকার রঙ আলাদা হলেও, বক্তৃতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেও এগুলি আসলে জাতীয় বুর্জোয়াদের অথবা আঞ্চলিক বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধিত্বকারী দল। দলগুলিকে এ ভাবে বিচার করে না বলেই তারা ভেবে পায় না, একটা দল নির্বাচনী বক্তৃতায় জনস্বার্থরক্ষার এত প্রতিশ্রুতি দিয়েও জেতার পর কেন আর জনস্বার্থে কাজ করে না, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

গত লোকসভা নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসের জনবিরোধী কার্যকলাপ এবং দুর্নীতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। তখন খেয়াল করেনি যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী আর একটি দলকে প্রচার দিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করছে। মাত্র দেড় বছরেই বিজেপির স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেছে। ঠিক যেমন এ রাজ্যে সিপিএমের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। ক'বছরেই মানুষ বুঝে গেছে, বাস্তবে রাজ্যে কোনও পরিবর্তনই হয়নি। এ সব কিছুই প্রমাণ করছে, বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া এই দলগুলিকে পাল্টাপাল্টি করে মানুষের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। আজ দরকার যথার্থই তার নিজের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণিদলকে চিনে নিয়ে তাকে শক্তিশালী করা।

নারী নির্যাতন বেড়েছে আরও
নারী নিরাপত্তা অথৈ জলে

২০১৩ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে মহিলাদের উপর অপরাধ বেড়েছে ৯ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে ধর্ষণ, খুন, শ্লীলতাহানি, অপহরণ, পারিবারিক অত্যাচার সমস্তই রয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এন সি আর বি) প্রকাশিত এই তথ্য ২ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় তুলে ধরেছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিভাই পার্থিভাই চৌধুরী। রিপোর্টে জানা গেছে ২০১৪ সালে ঘটা ধর্ষণের ঘটনার ৯০ শতাংশ ঘটেছে আত্মীয়, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের দ্বারা। আরও ভয়ঙ্কর হল, প্রতিদিন ৮৪৮ জন মহিলা শারীরিক অত্যাচার বা শারীরিক হেনস্থার শিকার হন কিংবা অপহৃত হয়ে খুন হন। আর কিছু সংখ্যক পাচারকারীদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যান। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৪ সালে মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯২২টি। ২০১৩ সালে যা ছিল ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪৬টি। রিপোর্টে আর একটি ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। শিশু নির্যাতনের হার বেড়েছে ৫৩ শতাংশ। প্রসঙ্গত, এ বছর অক্টোবরে দিল্লি হাইকোর্ট এক রায়ে বলে, 'শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন 'মহামারী'র আকার নিয়েছে। এটা এখন একটা বড় সামাজিক ব্যাধি।' রিপোর্ট বলছে, ২০১৩ সালে শিশু নির্যাতন ঘটেছিল ৫৮ হাজার ২২৪টি, ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮৯ হাজার ৪২৩টি। ২০১৫ সালও প্রায় অতিক্রান্ত। আরও বহু ঘটনার নির্মম সাক্ষী হয়েছে দেশবাসী। আর শুধুমাত্র নথিভুক্ত হয়েছে এমন ঘটনার সংখ্যাই এত ভয়াবহ।

বিপুল খরচ সহকারে মোদি সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর গালভরা স্লোগান তুলছে, মেয়েদের 'উন্নতি' সাধনের চটকদারি নানা বিজ্ঞাপন ও মনরাখা নানা কৌশলকে ভোটের প্রচারে হাতিয়ার করা হচ্ছে, অথচ বাস্তবে 'বেটিদের' কী করুণ অবস্থা তা সরকারি তথ্যই তুলে ধরেছে।

দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের তিন বছর অতিক্রান্ত। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লির প্যারামেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়ার উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনায় শিউরে উঠেছিল দেশ। প্রবল শীতে ছাত্র-অভিভাবক সহ বহু মানুষ দিল্লির রাজপথে পুলিশের জলকামান ও লাঠির মোকাবিলা করে অত্যাচারীর শাস্তির দাবিতে ছিল অনড়। শুধু দিল্লি নয়, দেশের প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সোচ্চার মিছিলে পা মিলিয়েছিল। নাবালক ধর্ষকের শাস্তি দিতে আইনের পরিবর্তন পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। নির্ভয়ার মা-বাবার সাথে আপামর বাবা-মায়েরা চেয়েছিল, এরকম নৃশংস ঘটনা যেন আর না ঘটে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আজও প্রতিদিন কত 'নির্ভয়া'র জীবনে নেমে আসছে তেমনই অভিশপ্ত দিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা প্রভাবশালী হাতের কারসাজিতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের আশ্রয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলছে। বেড়েই চলেছে অপরাধের সংখ্যা ও অপরাধের মাত্রা। অপরাধ গোপন করতে গুম-খুন করা হচ্ছে। সাক্ষীদের পর্যন্ত খুন করে ফেলা হচ্ছে।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দেশে ৯ শতাংশ অপরাধ বৃদ্ধির নজির আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলছে। অভিভাবকরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এই সমস্যার প্রতিকার খুঁজছেন। প্রতিকার কীভাবে সম্ভব? সমাজের এই দুষ্ট ব্যাধি মুক্ত করতে হলে অপরাধীর নজিরবিহীন শাস্তি যেমন দরকার, তেমনই টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে অপরাধের সহায়ক অশ্লীল বিজ্ঞাপন এবং মদের প্রসার বন্ধ করা দরকার। নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নে দেশের শাসকরা এ সব নিয়ে কিছুমাত্র ভাবছেন কি? শুধু কিছু গালভরা স্লোগান ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকার দায়িত্ব সারছে, কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

বারাকপুর চটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল

বারাকপুর মহকুমার নফরচাঁদ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি হুকুমচাঁদ জুটমিল আংশিকভাবে চালু হলেও মালিকের অন্যায় শর্তের জন্য বহু শ্রমিকই কাজে যোগদান করতে পারছেন না। দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকা চটকলগুলির শ্রমিক পরিবারে আর্থিক সংকট ভয়াবহ। চটকল মালিকরা সামাজিক সুরক্ষা আইনগুলিকে লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের পি এফ, ই এস আই এবং গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চটকলগুলি খোলা, শ্রমআইন ভঙ্গকারী মালিকদের গ্রেপ্তার করা, কাজের প্রথম দিন থেকেই পি এফ, ই এস আই-এর সুবিধা এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির দাবিতে ৪ ডিসেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে দেড় শতাধিক চটকল শ্রমিক বারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন চটকলের ৭ জন শ্রমিক প্রতিনিধি মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী সহ কমরেডস চন্দ্রশেখর চৌধুরী, মঙ্গল রায়, মনোজ দাস প্রমুখ।

খড়্গপুর কলেজে আন্দোলনে ফি কমল ৫০০ টাকা

খড়্গপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের ফি প্রায় ১০০০ টাকা বাড়িয়ে দেয়। এ আই ডি এস ও সাথে সাথে তার প্রতিবাদ জানায়। সংগঠনের নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করে ৮ ডিসেম্বর গভর্নিং বডির মিটিং ডাকে। সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়। সভায় ডি এস ও প্রতিনিধি-র যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও বাইরে আন্দোলনরত ছাত্রদের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০০ টাকা ফি কমানোর কথা ঘোষণা করে। উল্লেখ্য তৃণমূল ছাত্রপরিষদ পরিচালিত ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ফি বাড়ানোর পক্ষেই ছিলেন। এই ছাত্র আন্দোলন দেখিয়ে দিল অন্যায় ফি বৃদ্ধি ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই রুখে দেওয়া যায়।

‘চাষির জমি ফিরিয়ে দাও’— সিঙ্গুরের দাবি

সিঙ্গুর আন্দোলনের দশ বছর পূর্তি দিবস ২ ডিসেম্বরকে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ‘দাবি দিবস’ হিসাবে পালন করা হয়।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফলে ৩৪ বছরের সিপিআই (এম) অপশাসনের অবসান ঘটে এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতায় আসে। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা ব্যানার্জী কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গত সাড়ে চার বছরেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। জমি হারানো মানুষগুলি চরম অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগ ও যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসও যে এ বিষয়ে আন্তরিক নয়, তার প্রতিফলন দেখা গেছে তাদের এদিনের সভায়। অতীতের সেই ধূমধাম নেই, নেতা-মন্ত্রীদের কাউকেই দেখা যায়নি। কোনওমতে সারা হল সিঙ্গুর দিবস।

তাই এদ্দিন সিঙ্গুর স্কুল মোড়ে এস ইউ সি আই (সি) আয়োজিত সভায় দাবি করা হয় ঃ আদালত নয়, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকেই জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। অতীতের উদ্ভ্রান্ত আন্দোলনের নজির অনুযায়ী আইন নয়, ন্যায়ের পথে কৃষকের জমি কৃষককে চাষ করতে দিয়ে তাকে সরকারি বৈধতা দিতে হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন সিঙ্গুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটির অন্যতম নেতা তপন দাস, কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শংকর জানা, শিক্ষক নেতা প্রদীপ সিং, রতন মালিক, সিঙ্গুর আন্দোলনের নেত্রী চৈতালী ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জেলা কে কে এম এসের নেতা দীপক সিংহ, অরূপ খাঁড়া প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জমি রক্ষা কমিটির সদস্য অমিতা বাগ।

পাশ-ফেল ঃ ঠেকে শিখছে রাজস্থান

শিক্ষার অধিকার আইনের মধ্য দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজস্থান সরকার এই আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনে। কেন এই সংশোধনী? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজস্থানের চিফ সেক্রেটারি সি এম রাজন বলেন, শিক্ষার অধিকার আইন শিক্ষাকে সর্বজনীন করেছে। কিন্তু শিক্ষার গুণমানের কথা ভাবলে, আমরা দেখছি অবনমন ঘটেছে। বিভিন্ন নিরপেক্ষ সমীক্ষা বলছে, ড্রপ-আউটের হার বাড়ছে, শিক্ষার মানের অবনমন ঘটেছে। ফলে আমাদের মনে হয়, শিশুকে শুধু বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিলেই হবে না, শ্রেণি উপযোগী শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করাও জরুরি। সেই কারণে শিক্ষার অধিকার আইনের সংশোধনী আনার কথা আমরা ভাবি।

শ্রেণি উপযোগী শিক্ষা কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটা প্রত্যাশিত যে, সাত বছরের একজন বালক বা বালিকা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার অধিকারী। কিন্তু যদি সে সিলেবাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগোতে না পারে, সে পিছিয়ে পড়বে। অবাধ প্রমোশন নীতিতে কিছু না শিখেই তার উচ্চতর শ্রেণিতে উঠতে বাধা নেই। এটা নৈতিকতা এবং মানবিকতাকে আঘাত করে। শিশু পিছিয়ে পড়তে শুরু করে এবং শেষপর্যন্ত স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন, শিক্ষার অধিকার আইন এবং অবাধ প্রমোশন নীতি চালু হওয়ার পর ড্রপ আউট বা স্কুল ছাড়ার হার বেড়েছে। ২০১২-’১৩ সালে প্রাইমারিতে ড্রপ আউট রেট ছিল ৪.৭২ শতাংশ। ২০১৪-’১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮.৪০ শতাংশ। আপার প্রাইমারিতে (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি) ড্রপ আউট রেট ২০১৩-’১৪-তে ছিল ২.০১ শতাংশ, ২০১৪-’১৫তে বেড়ে হয়েছে ৬.০৫ শতাংশ।

আপনারা কী পরিবর্তন আনছেন?

তিনি বলেন, আমরা সংশোধনীতে বলেছি, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী বালক-বালিকাদের শ্রেণি উপযোগী শিক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। দ্বিতীয় সংশোধনী এনেছি শ্রেণি উপযোগী সিলেবাস প্রবর্তনের ক্ষেত্রে। তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়েছে শিশুর মূল্যায়নে শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে। চতুর্থ সংশোধনীতে শিক্ষকরা যাতে দায়িত্ব পালন করেন তা নিশ্চিত করার জন্য স্কুল পরিচালন সংস্থাকে অধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অবাধ প্রমোশন নীতিতে সংশোধনী এনে বলেছি, শ্রেণি উপযোগী শিক্ষার মান অর্জন করতে না পারলে ছাত্রকে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দেওয়া হবে না।

কিন্তু সমালোচকরা তো বলেন, অবাধ প্রমোশন নীতি তুলে দিলে শিক্ষার মৌলিক অধিকারই বিপন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি আদৌ তা মনে করি না। আমি মনে করি, শিক্ষার মৌলিক অধিকার মানে শুধু এই নয়, শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার বা শিক্ষা শেষ করা। এর সঙ্গে যেটা যুক্ত করতে চাই সেটা হল শেখার মৌলিক অধিকার, শুধু স্কুলে আসা এবং স্কুল পর্ব শেষ করা নয়।

(টাইমস অফ ইন্ডিয়া ঃ ২৫.১১.২০১৫)

নিজের দেশের মানুষকে কেমন রেখেছে মার্কিন শাসকরা

বিশ্বের ত্রাতা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরে মার্কিন শাসকরা। তার জন্য দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধানো, গণতন্ত্র রক্ষার নামে অন্য দেশের উপর আক্রমণ— সবই তারা করে চলেছে অনায়াসে। ’৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের পতনের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আগ্রাসন আরও বেড়ে চলেছে। নিজের দেশের মানুষকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সাত বছরের শাসনে মার্কিন নাগরিকদের কেমন রেখেছে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা? মানুষের ‘স্বপ্নের’ আমেরিকার আসল চেহারাটা দেখা যাক। সরকারি তথ্যই চমকে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট।

১) দেশের মোট ঋণ ৫৫ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রত্যেকটি মানুষ, এমনকী প্রতিটি শিশুর ঘাড়ে ৪২ হাজার ডলারের ঋণ।

২) চাকরির বাজারে চূড়ান্ত মন্দা। মার্কিন শ্রম দপ্তরের হিসাব বলছে, ৮.৭ মিলিয়ন যুবক বেকার। এ ছাড়াও ৬.৭ মিলিয়ন যুবক আংশিকভাবে কর্মরত। অর্থাৎ অর্ধবেকার। লক্ষ লক্ষ পদ ফাঁকা। বেকার যুবকরা চাকরির আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই, এই অজুহাতে নিয়োগ করা হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষিতদেরও উপযুক্ত মাইনে দেওয়া হচ্ছে না।

৩) সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্বিচারে ছাঁটাই চলছে, চলছে লে-অফ। গত চার বছরের মধ্যে ২০১৫-র জুলাই মাসে ছাঁটাই ও পদ-বিলুপ্তি হয়েছে সর্বোচ্চ। গত মাসে লে-অফের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৯৬টি। রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ‘আউটপ্লেসমেন্ট কনসালটেন্সি চ্যালেঞ্জার, গ্রে অ্যান্ড ক্রিস্টমাস’। জানা গেছে, জুলাইয়ে বেসরকারি কোম্পানিতে কাজের হার কমেছে ব্যাপক হারে। প্রযুক্তি দপ্তর, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগুলি ১৮ হাজার ৮৯১ জনকে লে-অফ করার ঘোষণা করেছে জুলাই মাসে। মাইক্রোসফট দপ্তর নোকিয়াকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যাতে ৭৮০০ জন কাজ হারিয়েছে। ইনটেলও ৩ হাজার ১৮০ জনকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে।

৪) ওয়ালমার্ট বা কেমার্টের মতো বড় বড় দোকানে প্রকাশ্যে বন্দুক বিক্রি হচ্ছে। অস্ত্র এতই সুলভ যে, দোকান থেকে পটেটো চিপসের প্যাকেটের সাথে সেমি-অটোমেটিক মারণাস্ত্র ও বুলেট কিনে বাড়ি ফেরা যায় অনায়াসেই।

৫) আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ‘ওবামা কেয়ার’-এর বহুল প্রচার চলে, কিন্তু তা কোনও পরিষেবাই দিতে পারছে না মানুষকে।

৬) ২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ পৌঁছেছে ৮২১ বিলিয়ন ডলারে, ২০১০-এ ছিল ৭৫৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রতিদিন খরচ হয় ২০৬ কোটি ডলার। অথচ মার্কিন সেনাবিভাগ ব্যয়সংকোচের অজুহাতে ৪০ হাজার সৈন্যকে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। ১২০টি দেশে ৭০০-র বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে আমেরিকার।

(১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ, ১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি, ১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি)

সূত্র ঃ ইটিসিএনবিসি ডট কম, ৬ আগস্ট, ২০১৫

রাজ্যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যুক্ত মিছিল

১-৬ ডিসেম্বর সারা দেশ জুড়ে এস ইউ সি আই (সি) সহ ছয় বামপন্থী দল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ব্যাপক প্রচারাভিযানে সামিল হয়। ১৯৯২ সালে বিজেপি সরকার ও সংঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের প্ররোচনায় এবং উদ্যোগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের যে কলঙ্কিত ঘটনা ঘটেছিল

তার প্রতিবাদেই ছিল এই প্রচারাভিযান। কেন ২৩ বছর আগের একটি ঘটনা নিয়ে এই প্রচার? কারণ বর্তমানে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার উগ্র সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার ঘৃণ্য নীতি নিয়ে চলছে। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করাই শুধু এর উদ্দেশ্য নয়, পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থে সংস্কার করতে গিয়ে জনজীবনে মোদি সরকার যে মারাত্মক অর্থনৈতিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে সেদিক থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন অঙ্কুরে বিনাশ করতে শোষিত জনগণকে ধর্মে বর্ণে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রাখাও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই শয়তানির মুখোশ খুলে দিয়ে সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদে এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই (এম), সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এমসিপিআই (ইউ) প্রভৃতি দলের উদ্যোগে বিশাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চন্দ্রকুমার। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর।

৪ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে প্রতিবাদী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শুরুর আগেই তেলেগু দেশম পার্টি পরিচালিত অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের নির্দেশে বিশাল পুলিশবাহিনী শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালায়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে এস ইউ সি আই (সি) বিশাখাপত্তনম জেলা সম্পাদক কমরেড এস গোবিন্দরাজালু গ্রেপ্তার হন। ৬ ডিসেম্বর কুর্নুলও বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড বি এস অমরনাথ বক্তব্য রাখেন। ৫ ডিসেম্বর অনন্তপুরমে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ জেলার ৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১-৬ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই (এম), সিপিআই, সিপিআই (এম এল) প্রভৃতি দলের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সভাগুলিতে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড এস কে মালবিয়া সহ কমরেডস রাজেন্দ্র, সুমন শুক্লা, কমলেশ, আশু ঠাকুর, রেশমী মালবিয়া প্রমুখ। ৬ ডিসেম্বর জৌনপুরের সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে কমরেড জগদীশ চন্দ্র আস্তানা।

দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যেও প্রচার মিছিল, সভা হয়।

মুর্শিদাবাদে সি পি ডি আর এস-এর প্রতিবাদ সভা

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ, ডোমকল এবং বহরমপুরে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জের সভায় বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুর কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সিপিডিআরএস-এর মহকুমা সম্পাদক মুরসেদ জাহাঙ্গীর, আইনজীবী সুব্রত মুখার্জী প্রমুখ। ডোমকলে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন ডোমকল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রেজিস্ট্রার বাইজিদ হোসেন, লেখক সেখ সদর আলি, হজরত আলি প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা মোশারফ হোসেন।

বহরমপুর গোরাবাজার নিমতলার মোড়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নেতা এম সিরাজ, সুব্রত গোস্বামী, ননীগোপাল কর্মকার প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক মেহেবুব আলম, প্রধান শিক্ষক নিমাইচরণ সাহা, শিক্ষক খোন্দেকার গোলাম মোর্তজা, সংগঠনের জেলা সমন্বয়কারী দেবাশীষ চক্রবর্তী, লেখক শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মানুষও সভায় বক্তব্য রাখেন।

ক্লেদাক্ত নারী জীবনই পুঁজিবাদের উপহার

দারিদ্রের যন্ত্রণা, অনাহার থেকে সন্তানকে বা পরিবারকে বাঁচাতে মহিলারা পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, নিজেকে বিক্রি করতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন— ভারতের যে কোনও শহরে বা গ্রামে আজ অচেনা কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু যদি কোনও মহিলা ডাক্তার দারিদ্রের জ্বালায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য এই কাজ করতে বাধ্য হন! আর সেই দেশটা যদি হয় 'উন্নত' ইউরোপের কোনও দেশ! সমাজ কোন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে পড়লে এ ঘটনা ঘটতে পারে?

এমন এক ঘটনাকেই তুলে ধরেছেন গ্রিসের মহিলাদের উপর নির্মিত বিবিসির এক তথ্যচিত্রের নির্মাতারা। এথেন্সের এক মহিলা ডাক্তারের কাহিনি শুনেছিলেন তাঁরা। জর্জিয়া নামের মহিলা চিকিৎসক ভালোই প্র্যাকটিস করতেন কিছুদিন আগেও, এখন দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, রোগ হলেও ডাক্তারের ফি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। সপ্তাহে তিনজনের বেশি রোগী হয় না। স্বামীর চাকরি গেছে, পরিবারে আর কোনও রোজগেরে সদস্য নেই। বাড়ি ভাড়া বাকি, ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় কাঁদে। অবশেষে অসহায় এই চিকিৎসক-মাতা নিজের দেহ বিক্রি করে কিছু উপার্জনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রিসের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সোস্যাল রিসার্চ সমীক্ষা করতে গিয়ে এমন কত যে করুণ কাহিনি তুলে এনেছে তার শেষ নেই।

আরও এক মায়ের কথা। ইউরোপের নাক-উঁচু সংবাদমাধ্যম তাঁকে 'মনস্টার মম' (রাক্ষুসি মা) বলে চিহ্নিত করে নিজেদের খুব দরদি প্রমাণ করতে চেয়েছে। তিনি তাঁর ১২ বছরের মেয়েকে এক দালালের মাধ্যমে ধনী প্রৌঢ়ের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। আইন তাঁকে শাস্তি দিয়েছে ৩৩ বছরের কারাদণ্ড আর ১০ লক্ষ ইউরো জরিমানা। কিন্তু তারা বলেনি, কোন পরিস্থিতিতে একজন মাকে তার বুকের ধন সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবতে হয়? তা-ও ইউরোপের মতো উন্নত বলে পরিচিত সমাজে দাঁড়িয়ে!

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এই সাম্রাজ্যবাদী ত্রয়ীর শর্ত মেনে নিয়ে দেশের মেয়েদের এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকেই ঠেলে দিয়েছে গ্রিসের সরকার। সে দেশে চলছে সরকারি ব্যয় সংকোচ নীতি। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে সরকার আর ব্যয় করবে না। সেই অর্থ যাবে ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক কর্তাদের ঋণ শোধ করার খাতে। পুঁজিপতিদের জন্য ভর্তুকি চালু থাকলেও মানুষের জন্য কোনও পরিষেবা, পেনশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি কোনও খাতে সরকার এক পয়সাও দেবে না। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অভিভাবকরা নিদান হেঁকেছেন এই পথেই গ্রিস তার সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে। এই ঋণ কি গ্রিসের মানুষ নিয়েছে? তারা এর এক পাই পয়সাও ভোগ করেছে কি? জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল সমস্ত মহাজনের মতোই বলেছিলেন, ঋণের অর্থ গ্রিসের জনগণের উপকারে লেগেছে, তারা তা শোধ দেবে না কেন? বাস্তব কিন্তু তা নয়, গ্রিস যাতে জার্মান সাবমেরিন আর অস্ত্র কেনে তার জন্য জার্মান পুঁজিপতিরা সে দেশের সরকারি উচ্চমহলে কোটি কোটি ইউরো ঘুষ ঢেলেছিল। সেই সাবমেরিন, যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য জার্মানির ব্যাঙ্ক মালিকরা গ্রিসকে ঋণ দিয়েছে। ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিরাও ঋণ দিয়েছে গ্রিসের পরিষেবা ক্ষেত্রকে দখল করতে। অর্থাৎ জার্মানি সহ অন্যান্য ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা গ্রিসকে ঋণ নিতে বাধ্য করেছে যাতে নিজেদের লগ্নির বাজার খোলে। তাদের মুনাফার দায় এখন গ্রিসের জনগণ শোধ করছে নিজেদের জীবনের সুখ-স্বস্তি থেকে শুরু করে দেশের সংরক্ষিত দ্বীপ পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে। এরই ফলে গ্রিসের সমাজ জীবনে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। মায়ের সন্তান বিক্রি করতে যাওয়ার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে অনেককেই। তার মধ্যে একজন প্যান্টেইয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি লাক্সস। তিনি শুরু করেন এই অসহায় মেয়েদের নিয়ে সমীক্ষা। যেটুকু তথ্য পেয়েছেন, তাতেই চমকে উঠেছেন লাক্সস। মাত্র ২ ইউরোর বিনিময়ে আধঘন্টার জন্য মেয়েরা নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছে। ধকল সামলে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আবার খদ্দের জোগাড়ের জন্য রাস্তায় দাঁড়াতে হয়। কারণ ঘরে যে অনেকগুলো মুখ খাবারের আশায় তাঁর পথ চেয়ে আছে। কিছুদিন আগেও ব্রথেলের খরিদ্দারদের কমপক্ষে ৫০ ইউরো খরচ করতে হত। এখন এত অসংখ্য মেয়ে নিজের দেহ বিক্রি করতে রাস্তায় নামছে যে, তাদের পেট চালানোর মতো রোজগারটুকুও জুটছে না। এমনও আছে— ১৭-১৮ বছরের মেয়েরা শুধু একটা স্যান্ডউইচ কি একটা ভেজিটেবল পাই-এর জন্য নিজেকে কোনও খদ্দেরের লালসা চরিতার্থের উপকরণ করে তুলতে বাধ্য হচ্ছে। খিদের জ্বালা কী ভয়ানক! ব্যয় সংকোচ নীতিতে সরকার সামাজিক প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তার সাথে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য কর ছাড়ের ব্যবস্থা করতে দেশের সাধারণ মানুষের উপর কর চেপেছে উচ্চহারে। সমীক্ষকরা এমন উদাহরণও পেয়েছেন যেখানে, মেয়েরা দেহ বিক্রি করতে গেছে কর মেটানোর টাকা জোগাড় করতে।

গ্রিস

দেখা যাচ্ছে পতিতাবৃত্তিতে পূর্ব ইউরোপের মেয়েদের জায়গা নিচ্ছে গ্রিসের মেয়েরাই। পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল হঠাৎ আর্থিক দুর্যোগে পড়া নিরুপায় পরিবারগুলি থেকে মেয়েরা দলে দলে গ্রিস সহ ইউরোপের নানা দেশে পতিতাবৃত্তি করতে যাচ্ছে। পুঁজিবাদ তাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে যে নরক রচনা করেছে তার আঁচ সবচেয়ে বেশি করে লেগেছিল মেয়েদের গায়েই। কারণ প্রবল অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে সন্তানকে বাঁচানোর দায়, পরিবার প্রতিপালনের দায় সবচেয়ে বেশি করে পড়ে তাদের উপরেই। লাক্সস আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ১৭ থেকে ২০ বছরের অসংখ্য মেয়ে যেভাবে এই জীবনকেই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ হিসাবে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে অচিরেই সারা দেশেই পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ শুধু গ্রিসের সমস্যা নয়, টাইমস পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে সাংবাদিক পল ক্রেগ রবার্টস ৩০ নভেম্বর তাঁর ইন্টারনেট কলমে লিখেছেন, আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উচ্চহারে টিউশন ফি জোগাতে যে শিক্ষা ঋণ নেয়, তা শোধ করার জন্য তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নিজেকে কোনও ধনীর কাছে বিক্রি করতে। এই হল পুঁজিবাদের রূপ। সারা দুনিয়ার মানুষকে আজ এই ক্লেদাক্ত জীবনই উপহার দিচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ১৯৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ভেঙে পুঁজিবাদী দুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানরা উল্লাসে উদ্বাহু হয়ে বলেছিল, এবার বিশ্ব হবে শান্তির স্বর্গ, মানুষের জীবনে আর সমস্যা রইল না। তারা বলেছিল, বিশ্বায়নের নীতি দেশে দেশে আনবে উন্নয়নের জোয়ার। ২৫ বছর আগেকার সেই উল্লাস আজ জনগণের আর্তনাদে পরিণত। গ্রিসের মেয়েরা আজ নিজের জীবন, দেহ-মন, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের লালসার সামগ্রী হয়ে জরাগ্রস্ত এই সমাজের দায় বহন করছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ না করলেই নয় যে, সমাজতন্ত্র সমাজ থেকে পতিতাবৃত্তিকে দূর করতে সফল হয়েছিল। মানবজাতিকে আবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইতেই নামতে হবে।

চেন্নাইয়ের বিপর্যয়ের জন্য শুধু বৃষ্টি দায়ী নয়

চেন্নাই শহরের ভয়াবহ বন্যায় সকলে স্তম্ভিত। চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর অন্যত্র সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪৭। বন্যার দিনগুলিতে মানুষ দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে কাটিয়েছে। বিদ্যুৎ, পানীয় জলের অভাব, খাদ্য নিয়ে কালোবাজারি, পেট্রোল, ডিজেলের প্রবল ঘাটতিতে মানুষ অসহায়ভাবে বন্যার জল কমার জন্য দিন গুনেছে।

এর মধ্যেই চেন্নাই শহর সংলগ্ন চেম্বারামবাক্কাম রিজার্ভারের জল ছাড়া নিয়ে জয়ললিতা সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। আবহাওয়া দপ্তর ১-২ ডিসেম্বরে প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাষ দিলে এই বাঁধের জল ধারণের সীমা ২২ ফুট থেকে ১৮ ফুটে নামিয়ে আনার অনুমতি চেয়ে পি ডবলিউ ডি অফিসাররা ১৮ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে চিঠি দেন। সরকার তার কোনও উত্তর দেয়নি। অবশেষে ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে বাঁধের জল ২৪ ফুট উচ্চতায় পৌঁছালে জল ছাড়া হয়। বৃষ্টির জলে যেখানে বন্যা হয়নি, বাঁধের ছাড়া জলে বিশাল অঞ্চল ভেসে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সরকারি সিদ্ধান্তহীনতা, উদাসীনতাই কি এতো মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়?

বন্যার জল নামার পর দেখা যাচ্ছে রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। কোনও যানবাহন তাতে চলাচল করতে পারছে না। মানুষ আকাশপথে যাওয়ার জন্য টিকিট কাটতে গিয়ে আবিষ্কার করছে ১০ হাজার টাকার টিকিট ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম নির্ধারণের আইন পাশ করেছে। তার জোরে বিমানসংস্থাগুলি মানুষের অসহায়তাকে পুঁজি করে তাদের বিপুল মুনাফা লুটছে।

তামিলনাড়ুর সরকার বলছে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস এই ভয়াবহ বন্যার কারণ। কিন্তু শুধুই কি তাই? দেশের নানা প্রান্তে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠেছে। চেন্নাই শহরের জলমগ্ন পরিস্থিতি, এতো মানুষের মৃত্যু অন্যান্য মহানগরগুলির নগর পরিকল্পনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ২০০২, ২০০৩, ২০১০ সালে দিল্লির বন্যা, ২০০৫-এ মুম্বই, ২০০৭ এ কলকাতা, ২০০৫ এবং '১৫-র তামিলনাড়ুর বন্যা, সবগুলির কারণ কমবেশি এক। সবকটিতেই যথেচ্ছ নগরায়ণকে দায়ী করা হয়েছে। তথাকথিত উন্নয়নের ধাক্কা মহানগরগুলি সহ্য করতে পারছে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চেন্নাই বন্যা নিয়ে ২ ডিসেম্বর এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেও নগরায়ণের নামে চেন্নাই শহর যদি তার প্রাকৃতিক জলনিকাশি ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করত তাহলে এই চরম বিপর্যয় এড়ানো যেত। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল সুনীতা নারেন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা বারবার বলছি, দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, শ্রীনগর ইত্যাদি দ্রুত বর্ধমান নগরগুলি তাদের প্রাকৃতিক জল সম্পদ যা আছে তার উপর নজর দিচ্ছে না। চেন্নাইয়ের জলাশয়গুলির বৃষ্টির অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাত ছিল। কিন্তু আমরা তার উপর বড় বড় বাড়ি বানিয়েছি। জল নিকাশির খাতগুলোও বন্ধ করে দিয়েছি।' সংস্থার গবেষণা থেকে জানা গেছে ১৯৮০ সালে চেন্নাইয়ে ছ'শোর বেশি জলাভূমি ছিল। ২০০৮ সালে একটি মাস্টার প্ল্যান বলছে এর বেশির ভাগই উবে গেছে। শহরে ১৯টি বৃহৎ জলাশয় মোট ১১৩০ হেক্টর জমি নিয়ে ছিল সেই সময়। ২০০০ সালের প্রথম দিকে তা কমে ৬৪৫ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। বাকি এলাকা জমি হাঙরদের কব্জায় চলে গেছে।

শুধু কি জমি হাঙর? সরকারের ভূমিকা কী? শহরের মাঝখান দিয়ে বাকিংহাম ক্যানেল বয়ে গেছে। এটি এক সময় বৃষ্টির জল নিকাশির মূল পথ ছিল। বর্তমানে এটির উপর দিয়ে দ্রুত যাতায়াতের মেট্রো প্রকল্প চালু হয়েছে।

শহরের প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য না মেনে যথেচ্ছ বহুতল গড়া হচ্ছে। শহরের মধ্যে ১২টি ক্যানেল ছিল, এগুলি এখন আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয়েছে। নানা নির্মাণও হয়েছে এর উপর। শহরের রাস্তা ২৮৭০ কিলোমিটার। কিন্তু তার পাশে বৃষ্টির জলবাহী নালার দৈর্ঘ্য মাত্র ৯৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩০ শতাংশ। নিকাশির পরিকল্পনা অত্যন্ত দুর্বল। চেন্নাইয়ে এর আগে ২০০৫, ২০১০, ২০১৩ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। তখনও এই প্রশ্নগুলি উঠেছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের শিরোনাম থেকে বন্যার খবর উঠে যাওয়ার পর সব কিছু ধামা চাপা পড়ে যায়।

উন্নয়নের নামে সুবিধামতো বহু আইন পাল্টে ফেলছে সরকার। যেমন সংশোধিত ২০১০ জলাভূমি আইনে বলা হয়েছে ৫০০ হেক্টরের কম মাপের জলাভূমি ধ্বংস করতে আর বাধা নেই। অথচ ৯০ শতাংশের বেশি জলাভূমির আকার এর কম। ফলে সেগুলো রক্ষা করার জন্য কোনও আইনের বেড়া আর থাকল না।

বিশেষজ্ঞরা শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যে মাস্টারপ্ল্যান বানাচ্ছেন তা হেলায় অমান্য করছে তথাকথিত উন্নয়নের কারিগররা। সম্প্রতি দিল্লির যমুনা নদীর সক্রিয় ফ্লাডজোনে ৬০ একরের মিলেনিয়াম পার্ক বাস ডিপো তৈরি হচ্ছে। দিল্লিতে জল বিশেষজ্ঞ হিমাংশু ঠাক্কর আক্ষেপ করেছেন, যমুনা ফ্লাডপ্লেন যথেচ্ছ ধ্বংস করা আটকাতে দেশে কোনও আইন নেই।

একদিকে যেটুকু আইনি সুরক্ষা ছিল তাকে পাল্টে দুর্বল আইন বানানো হচ্ছে, অন্যদিকে সেটুকুও মানার ক্ষেত্রে সরকারি ঢিলেমি চলছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার সরকারি তৎপরতায় চোখের আড়ালটুকুও থাকছে না।

সর্বত্র এই ঘটনা ঘটছে। সব বড় বড় শহর স্মার্ট সিটি তৈরির নামে ব্যাপক হারে জলাভূমি বোজানো হচ্ছে। জল নিকাশের স্বাভাবিক খাত নষ্ট করা হচ্ছে। এই শতাব্দীর শুরুতেই তাই মহানগরগুলি বারবার বন্যার কবলে পড়ছে।

হাজার হাজার মানুষ বেঘোরে মারা যাওয়ার পর নানা প্রতিশ্রুতির বন্যা চলে। সময় চলে গেলে সব ধামাচাপা পড়ে যায়। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বাবু, ক্ষমতালোভী রাজনীতিক এবং জমির দালাল ও রিয়েল এস্টেট কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের চক্র ফুলে ফেঁপে উঠছে। কোনও নিয়ম নীতি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার দায় এদের নেই। দেশের কর্ণধাররা সব জেনেও চোখ বুজে এই মৃত্যুমিছিল চলতে দিচ্ছে। বিবেচনা রহিত এই নগরায়নের দায় বহন করে জীবনের বিনিময়ে মূল্য চোকাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এরই নাম 'উন্নয়ন'।

খরা-পীড়িত বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল কমানো, লোডশেডিং-লো ভোল্টেজ বন্ধ করা, কৃষি ডোমেস্টিক এবং বি পি এল গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার দাবিতে ১০ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ দেখাল অ্যাবেকা। নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে বলেন কয়েক হাজার কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সাধারণ গ্রাহকরা টাকা জমা দিলেও বছরের পর বছর ধরে লাইন পাচ্ছেন না। বিদ্যুৎ মাশুল লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কৃষকরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে স্যালো সাবমারসিবল বসালেও লো ভোল্টেজ, টানা লোডশেডিং, খারাপ মিটার, সিঙ্গেল ফেজ মিটার প্রভৃতি কারণে জলের সমস্যা মিটছে না। বারবার কোটেশান দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগে বাঁশের খুঁটি না বদলানোর ফলে গবাদি পশুর সাথে মানুষের অকালমৃত্যু ঘটছে। নেতৃবৃন্দ রিজিওনাল ম্যানেজারের বিষয়টি জানালে তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ১) ইন্দাসে ১৩২ কেভি সাবস্টেশন দ্রুত তৈরি করা হবে, ২) বরো চাষে স্থায়ী বা অস্থায়ী সকলকেই কানেকশন দেওয়া হবে, ৩) বকেয়া কানেকশান এক মাসের মধ্যে দেওয়া হবে, ৪) বাঁশের খুঁটি ও খারাপ মিটার বদলানো হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, কৃষ্ণকান্ত রায়, অমিয় গোস্বামী, তারাপদ গরাই, বিজয় পাল প্রমুখ।

ভ্রম সংশোধন ঃ ৬৮ বর্ষ ১৮ সংখ্যায় 'জয়নগরের ময়দায় বনধ' সংবাদটিতে প্রতিবাদ সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন আঞ্চলিক কর্মী কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার নন।

জয়নগরে ৬ ডিসেম্বরের সম্প্রীতি বাইক মিছিল দক্ষিণ বারাশতের বাংলার মোড় থেকে শুরু হয়ে মায়াহাউড়ির পদুয়ার মোড়ে শেষ হয়। ভুলক্রমে পদ্মেরহাটে শেষ হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কুলতলি ঘটিহারানিয়া স্কুলে দুর্নীতি রুখে দিল ছাত্র-অভিভাবকরা

কুলতলি থানার ঘটিহারানিয়া স্কুলের ছাত্র-অভিভাবকরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্কুলের স্পনসর্ড কমিটির দুর্নীতি রুখে দিলেন। এই স্কুলের স্পনসর্ড কমিটি রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের টাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের যে পোশাক সরবরাহ করেছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের শুধু নয়, একেবারেই পরার অযোগ্য। প্রসঙ্গত, এই স্কুলে কিছুদিন আগে পর্যন্তই ছিল নির্বাচিত কমিটি যার নেতৃত্বে ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিনিধিরা। তৃণমূল সরকার স্কুলগুলিতে দলীয় আধিপত্য কায়েম করতে সর্বত্রই যেভাবে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে নিজেদের মনোনীত স্পনসর্ড কমিটি গঠন করছে, সেই একই কায়দায় এ বছর মে মাসে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে নিজেদের কিছু দলীয় লোককে বসিয়ে স্পনসর্ড কমিটি স্কুলের উপর চাপিয়ে দেয়। বিগত নির্বাচিত কমিটি পোশাকের বরাদ্দ ৪০০ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিত, কিন্তু স্পনসর্ড কমিটি নিম্নমানের কাপড় দিয়ে যে পোশাক বানিয়ে দিয়েছে, তা একেবারেই পরার অযোগ্য। এলাকার মানুষের অভিযোগ, মাথাপিছু ৪০০ টাকার বদলে ১৭০-১৮০ টাকার মধ্যেই পোশাক তৈরি করে বরাদ্দ পাঁচ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকার অধিকাংশই কমিটির মাথারা আত্মসাৎ করার ফলেই এ ঘটনা ঘটেছে।

ঘটিহারানিয়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় চুপড়িঝাড়া অঞ্চল এবং আশেপাশের মানুষের বহু কষ্টের দানে গড়ে উঠেছে। তাদের আবেগের সাথে জড়িয়ে থাকা এই স্কুলে এমন দুর্নীতি এলাকার মানুষ কোনওমতেই মানতে পারে না। আন্দোলনের জন্য এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'ঘটিহারানিয়া হাইস্কুল ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক সংগ্রাম কমিটি'। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হন। দরিদ্র ভ্যানচালক থেকে গৃহবধূরা পর্যন্ত আন্দোলনের ভলান্টিয়ার হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যেও স্কুল থেকে ফিরে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার চালিয়ে যায়। ১১ ডিসেম্বর পরীক্ষা শেষ হতেই দু'হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক মিছিল করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে জড়ো হয়ে নিম্নমানের সমস্ত পোশাক ফেরত দিতে শুরু করেন। প্রধান শিক্ষকের দপ্তর পোশাকে ভরে যায়। তারা দাবি জানায় ওই পোশাক ফেরত নিয়ে সকলকে বরাদ্দ ৪০০ টাকা দিতে হবে।

স্পনসর্ড কমিটির সভাপতি সুব্রত মাল প্রথমে পুলিশ ডেকে ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকারীদের হঠিয়ে দিতে চাইলেও শেষপর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, নিম্নমানের পোশাকের বদলে মাথা পিছু বরাদ্দ ৪০০ টাকা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে দেওয়া হবে।

আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এলাকার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাজাহান লস্কর, সৌমিত্র ভাণ্ডারি, রউফ গাজি, অসিত মণ্ডল, জলিল মোল্লা, দেবকুমার মণ্ডল প্রমুখ। সরকার মনোনীত স্পনসর্ড কমিটির বদলে নির্বাচিত স্কুল কমিটির দাবি জানান সকলেই। ২৩ ডিসেম্বর কমিটির পক্ষ থেকে গণকনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিজমের উপাদানসমূহ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্কসকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। এবার দ্বিতীয় অংশ।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা এর আগে কি সম্ভব ছিল না?

উত্তর ঃ না। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটা পরিবর্তন, মালিকানা সম্পর্কের প্রত্যেকটা আমূল পরিবর্তন হল নতুন নতুন উৎপাদিকা-শক্তি সৃষ্টি হওয়ার অপরিহার্য ফল। এইসব উৎপাদিকা-শক্তি পুরনো মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে আর মানানসই নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দেখা দিয়েছিল এইভাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকাল ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে চালু হয়েছিল একটা নতুন উৎপাদনব্যবস্থা, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচার (ছোট কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা)। সেটা ছিল তখনকার সামন্ততান্ত্রিক আর গিল্ডের সম্পত্তির সঙ্গে বেমানান। সেটা পুরনো মালিকানা সম্পর্কের পরিধি ছাপিয়ে গিয়েছিল, সেই ম্যানুফ্যাকচার জন্ম দিল নতুন ধরনের মালিকানা— ব্যক্তিগত মালিকানা। ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্যায়ে এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোনও রূপের মালিকানা সম্ভব ছিল না। সবার চাহিদা অনুসারে জোগান দেওয়ার জন্য যা পর্যাপ্ত সেই পরিমাণ উৎপাদনই শুধু নয়, উপরন্তু সামাজিক পুঁজি বাড়াবার এবং উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের আরও সম্প্রসারণের জন্য আবশ্যক উদ্বৃত্ত উৎপাদন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সবসময়ে থাকেই একটা প্রভুত্বকারী শ্রেণি, যেটা সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের পরিচালক, আর একটি গরিব উৎপীড়িত শ্রেণি। উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের স্তরের উপর নির্ভর করে শ্রেণি-দুটোর গঠন। মধ্যযুগ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল, তখন ছিল ভূস্বামী আর ভূমিদাস। মধ্যযুগের শেষ ভাগের শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই দক্ষ কারিগর ও তার অধীনে নানা শিক্ষানবিস আর দিনমজুরদের। সতেরো শতকে— ম্যানুফ্যাকচারার এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক; উনিশ শতকে— বৃহৎ কারখানা মালিক আর প্রলেতারিয়েত। এটা নিতান্ত স্পষ্ট যে, এ পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির তেমন ব্যাপক উন্নতি ঘটেনি যাতে সমাজের সকল সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া যায়। এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থা এমন ব্যাপকভাবে সমাজকে শৃঙ্খলিত করে রাখেনি যাতে তার উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ ব্যাহত হয়। কিন্তু বৃহদায়তনের শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে এখন, **প্রথমত**, পুঁজি আর উৎপাদিকা-শক্তি এমন পরিসরে সৃষ্টি হয়েছে যা এযাবৎ শোনা যায়নি, আর এইসব উৎপাদিকা-শক্তিকে অল্পকালের মধ্যে বাড়াবার উপায়-উপকরণ রয়েছে বিপুল পরিমাণে। **দ্বিতীয়ত**, এইসব উৎপাদিকা-শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাতে, পক্ষান্তরে বিপুল জনরাশি ক্রমাগত বেশি পরিমাণে নেমে যাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিতে। আর যে-পরিমাণে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত প্রভূত পরিমাণে বাড়ছে

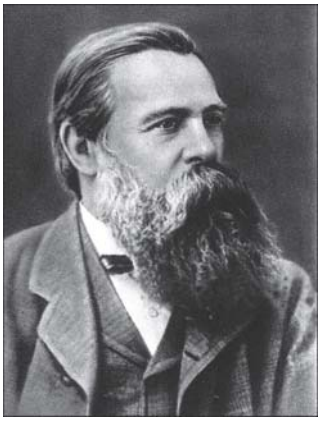

সেই পরিমাণেই বিপুল জনরাশির অবস্থা হয়ে পড়ছে আরও দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্বহ। **তৃতীয়ত**, এইসব উৎপাদিকা-শক্তি মহাশক্তিশালী, এগুলিকে বিপুল পরিমাণে বাড়ান যায় সহজেই। এগুলির বৃদ্ধি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বুর্জোয়াদের পরিধি এতখানি ছাড়িয়ে গেছে যাতে সমাজব্যবস্থায় অবিরাম প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঘটছে। শুধু এখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, সেটা হয়ে উঠেছে একেবারেই অপরিহার্য।

প্র ঃ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করা কি সম্ভব?

উ ঃ সেটা ঘটতে পারে। সেটাই কাম্য। তাতে কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে না। কমিউনিস্টরা খুব ভালোভাবেই জানে, ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতি অকার্যকর শুধু নয়, ক্ষতিকরও বটে। তারা খুব ভালোভাবেই জানে, ইচ্ছা করলেই নিজেদের মর্জিমাফিক বিপ্লব ঘটান যায় না। সর্বত্র এবং সর্বকালে বিপ্লবগুলি ছিল পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, সেটা বিশেষ পার্টি বা গোটা শ্রেণির ইচ্ছা আর নেতৃত্বের উপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়। কিন্তু তারা তেমনি লক্ষ করছে, প্রায় প্রত্যেকটা সভ্য দেশে প্রলেতারিয়েতের বিকাশ বলপূর্বক দমন করা হচ্ছে, এবং তার মাধ্যমে কমিউনিস্ট বিরোধীরা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে যাচ্ছে। নিপীড়িত প্রলেতারিয়েতকে শেষপর্যন্ত বিপ্লবের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলে আমরা কমিউনিস্টরা প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থকে সমর্থন করব কাজ দিয়ে, ঠিক যেমনটা এখন আমরা করছি কথা দিয়ে।

প্র ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি এক-ধাক্কায় খতম করা সম্ভব?

উ ঃ না। উৎপাদনের পুরনো শক্তিগুলিকে যেমন এক ধাক্কায় বহুগুণ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের উপায়ের উপর গোষ্ঠীর মালিকানা কায়েম করা যায় না, তেমনি এটাও করা সম্ভব নয়। সে কারণে সর্বহারা বিপ্লব, যা আগে বা পরে যে দিনই হোক না কেন নিঃসন্দেহে হবেই, তা শুধু ধীরে ধীরেই পুরনো সমাজকে পাল্টাতে পারবে। প্রয়োজন মতো উৎপাদনের-উপাদান সৃষ্টি করার পরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হবে।

প্র ঃ এই বিপ্লবের পথ কী হবে?

উ ঃ প্রথমে সেটা চালু করবে একটা **গণতান্ত্রিক সংবিধান** এবং সেই সূত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শাসন। সেটা প্রত্যক্ষভাবে হবে ইংলন্ডে, যেখানে ইতিমধ্যে জনগণের অধিকাংশ প্রলেতারিয়েত। ফ্রান্স আর জার্মানিতে পরোক্ষে— এই দুই দেশে জনগণের অধিকাংশ প্রলেতারিয়েত ছাড়াও খুদে কৃষক আর বুর্জোয়ারা। এরা এখন প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে, আর রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে প্রলেতারিয়েতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সেইজন্য প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ায় তাদের মত দিতে হবে শীঘ্রই। এতে হয়ত প্রয়োজন হবে একটা দ্বিতীয় লড়াই, কিন্তু সে-লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটবে শুধু প্রলেতারিয়েতের বিজয়ে।

গণতন্ত্র যদি ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরাসরি আক্রমণের আরও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রলেতারিয়েতের জীবন ধারণের একটা উপায় হিসেবে কাজে না লাগে তা হলে সেই গণতন্ত্রের কোনও মূল্য প্রলেতারিয়েতের কাছে নেই। বর্তমান অবস্থায় যেসব প্রধান প্রধান ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলিহল ঃ

১) বর্ধিত আয়কর, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর চড়া হারে কর, জ্ঞাতিসূত্রে (ভাই, ভাইপো ইত্যাদি) সম্পত্তি-প্রাপ্তির অবসান, বাধ্যতামূলক ঋণদান ইত্যাদি চালু করে ব্যক্তিগত মালিকানা সীমাবদ্ধ করা।

২) অংশত রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং অংশত ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভূসম্পত্তির মালিক, কল-কারখানা মালিক এবং রেলওয়ে ও জাহাজি কারবারের রাঘববোয়ালদের ক্রমে ক্রমে দখলীচ্যুত করা।

৩) সমস্ত দেশত্যাগী ব্যক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪) প্রলেতারিয়েতদের শ্রম বা বৃত্তিকে জাতীয় ভূসম্পত্তিতে, জাতীয় কল-কারখানা আর কর্মশালায় সংগঠিত করা, এবং তার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটান। রাষ্ট্র যা দেয় তেমনি বর্ধিত হারে মজুরি দিতে তখনও বিদ্যমান কল-কারখানা মালিকদের বাধ্য করা।

৫) ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজের সমস্ত সদস্যের কাজ করার সম-বাধ্যবাধকতা। বিশেষভাবে কৃষির জন্য শিল্প শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপন।

৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজিসম্পন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে ক্রেডিট আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্কারদের কোণঠাসা করা।

৭) জাতীয় কল-কারখানা, কর্মশালা, রেলওয়ে এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প বাড়ান;সমস্ত অনাবাদী জমি আবাদ করা এবং জাতির হাতে পুঁজি আর কর্মী যে-পরিমাণে বাড়ে সেই অনুপাতে আবাদী জমির উন্নয়ন।

৮) শিশুরা বড় হলে মায়ের যত্ন-পরিচর্যা ছাড়াই যেমন চলে, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ব্যয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা দান করা।

৯) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ, সেগুলি হবে শিল্পে এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত নাগরিকদের একত্রে বসবাসের স্থান। সেগুলিতে শহর ও গ্রামীণ জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে যুক্ত করতে হবে, যাতে কোনওটার একপেশেমি কিংবা অসুবিধা নাগরিকদের ভোগ করতে না হয়।

১০) সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং খারাপভাবে তৈরি বাসস্থান ও বসতি ভেঙে ফেলা।

১১) বৈধ এবং অবৈধ সমস্ত সন্তানের সমান উত্তরাধিকার।

১২) পরিবহণের সমস্ত উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

এই সমস্ত ব্যবস্থা অবশ্য একসঙ্গে চালু করা যায় না। কিন্তু সবসময়েই একটা থেকে আসবে অন্যটা। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রথম মূলগত আক্রমণটা সমাধা হয়ে যাওয়ার পর প্রলেতারিয়েত নিজেই দেখবে সে আরও এগিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে এবং সমস্ত পুঁজি, সমস্ত কৃষিকাজ, সমস্ত শিল্প, সমস্ত পরিবহণ আর বিনিময়ের সমস্ত উপায় ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে আসবে ঐসব ফল। আর প্রলেতারিয়েতের শ্রমের কল্যাণে দেশের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ যে-পরিমাণে বেড়ে উঠবে সেই অনুপাতেই ঐসব ব্যবস্থা হাসিল করা যাবে এবং সেগুলির কেন্দ্রীকরণের ফল ফলতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত পুঁজি, সমস্ত উৎপাদন, আর সমস্ত বিনিময় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে ব্যক্তিগত মালিকানা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, টাকা হয়ে পড়বে অনাবশ্যক, আর উৎপাদন এত বাড়বে, মানুষ এমনই বদলে যাবে, যাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কের শেষ চিহ্নটুকুও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্র ঃ শুধু কোনও একটা দেশে এই বিপ্লব ঘটা সম্ভব হবে কি?

উ ঃ না। বৃহদায়তনের শিল্প ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছে বিশ্ব-বাজার। তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষত সভ্য জাতিগুলি এমনভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে যাতে একটি জাতির ক্ষেত্রে যা ঘটছে তার উপর অন্যান্য জাতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তা ছাড়া, বৃহদায়তনের শিল্প সমস্ত সভ্য দেশের সামাজিক বিকাশের ধারাকে এতই সমস্তরে এনে দিয়েছে যাতে এই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া শ্রেণি আর প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠেছে সমাজের দু'টো নির্ণায়ক শ্রেণি। আর তাদের মধ্যে সংগ্রামটা হয়ে উঠেছে এখনকার দিনের মুখ্য সংগ্রাম। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবটা শুধু একটা জাতীয় বিপ্লব হবে না;সেটা ঘটবে সমস্ত সভ্য দেশে, অন্তত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে একই সাথে হবে। কোনও দেশে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি বিকশিত শিল্প, অপেক্ষাকৃত বেশি ধনদৌলত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদিকা-শক্তি। সেই অনুসারে এর প্রত্যেকটা দেশে বিপ্লব বিকশিত হতে সময় লাগবে তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম। এই বিপ্লবের গতিবেগ সবচেয়ে কম হবে এবং এই বিপ্লবে সাফল্য অর্জন করা সবচেয়ে কঠিন হবে জার্মানিতে। এই বিপ্লব সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজে সম্পাদিত হবে ইংল্যান্ডে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর এই বিপ্লবের বিরাট প্রভাব পড়বে এবং সেখানকার বিকাশের অনুকূল শক্তিসমূহকে রূপান্তরিত ও দ্রুততর করবে। এটা হবে বিশ্ব-বিপ্লব, তার প্রসারও হবে পৃথিবীব্যাপী। (পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

জনজীবনের দাবি নিয়ে ওড়িশায় বিশাল মিছিল

এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির ডাকে ৭ ডিসেম্বর ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমজীবী মানুষের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ভুবনেশ্বর রেলস্টেশন থেকে শুরু হয়ে ওড়িশা বিধানসভায় পৌঁছায়। গোটা ওড়িশা রাজ্যকে খরা কবলিত ঘোষণা করা, ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যা রোধ, আত্মঘাতী কৃষকের নিকট আত্মীয়কে ন্যূনতম ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান, নারী নির্যাতন বন্ধ, কালোবাজারি মজুতদারি রোধ করে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, সুলভমূল্যে বিদ্যুৎ, পাশ- ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল-বিড়ি-নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রভৃতি দাবিতে এই গণমিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিধানসভার সামনে পৌঁছালে সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধুর্জটি দাস। বক্তব্য রাখেন কমরেডস বিষ্ণু দাস, রঘুনাথ দাস, উদ্ধব জেনা, সদাশিব দাস প্রমুখ রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দলের রাজ্যকমিটির সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করে।

গুজরাটে ১৪ লক্ষ শিশু স্কুলশিক্ষার বাইরে

গুজরাটে প্রতি বছর শিশু-কিশোরদের ১০০ শতাংশই স্কুলশিক্ষা পেয়ে থাকে বলে ১১ বছর ধরে ঢাক পিটিয়ে চলেছে গুজরাটের বিজেপি সরকার। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত 'শলা প্রবেশ' উৎসবে প্রচারের ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে রাজ্যের জনগণনা রিপোর্ট। ওই রিপোর্ট দেখিয়েছে, ৬-১৮ বছর বয়সি ১৪.০৩ লক্ষ (৯.৬৩ শতাংশ) শিশু ও কিশোর কখনই স্কুলের মুখ দেখেনি। তার মধ্যে ৫৩ শতাংশই শিশুকন্যা-কিশোরী ও যুবতী। গুজরাটে এই বয়সি শিশু ও যুবকের সংখ্যা ১.৫৫ কোটি।

গুজরাট সরকার শিশুকন্যাদের স্কুলের আওতায় আনার জন্য 'শিশুকন্যা ভর্তি অভিযান' গ্রহণ করেছে ২০০৪ সালে। যার গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'কন্যা কেলাভনি'। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০০৯ সাল থেকে 'রাইট টু এডুকেশন' চালু করা হয়েছে সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার নামে। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার হাল কী, তা এই পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক গৌরাঙ্গ জনি বলেছেন, ১০০ শতাংশ ছাত্রের স্কুলশিক্ষার আওতায় আসার দাবি পুরোপুরি মিথ্যা। তিনি তথ্য দিয়ে দেখান, বেশিরভাগ শিশুরই স্কুলে আসতে না পারার প্রধান কারণ, পরিবারের চূড়ান্ত আর্থিক অভাব। জুহাপুড়ার ১৮ বছরের রেশমা শেখ, ফারহানা মালিক, আমেদাবাদের পুনম ভানজারারা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বাবার অতর্কিত মৃত্যু এবং ছোট ভাইবোনেদের দায়িত্বভার চাপায় আর্থিক অভাবে স্কুলের চৌকাঠ ডিঙোয়নি রেশমা। বাবা-মা এখানে ওখানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোয় পুনমের স্কুলে ভর্তি হওয়াই হয়ে ওঠেনি। পুনমের বাবা ঝাড়ু বিক্রেতা। পরিস্থিতির চাপ ও আর্থিক অভাব পুনম, রেশমা, ফারহানাদের স্কুলশিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করেছে। এ সব নেতা-মন্ত্রীরা ভালো করেই জানেন, তা সত্ত্বেও মিথ্যা প্রচারে ভুলিয়ে তারা জনগণকে বোকা বানাতে চান।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে গুজরাটে সভা

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আমেদাবাদের সরদারবাগে বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুভমেন্ট ফর সেকুলার ডেমোক্রেসি, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, আমেদাবাদ উইমেনস অ্যাকশন গ্রুপ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের সভায় যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার ছত্রে ছত্রে দেখানো হয়েছে, ভারতে কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ভারতে ১০ শতাংশ ধনী ৫০ শতাংশ দূষণ ছড়াচ্ছে, নিরক্ষরতার নিরিখে বিশ্বে ভারত দ্বিতীয়, ২০১৪ সালে ভারতে প্রতিদিন ৩৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৫৬ জন নারী এবং ৬১ হাজার ৪৪৪ জন শিশু নিখোঁজ, সেজের জন্য অধিগৃহীত জমির ৯০ শতাংশই অব্যবহৃত, প্রতিবছর প্রায় দেড়লক্ষ মানুষ পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়।

গুজরাট এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানে প্রতিবছর ন্যূনতম ৭ হাজার ২২৫ জন মানুষ আত্মহত্যার শিকার। সিপিসিবি-র হিসাবে খরাপ্রবণ এই রাজ্যে ২০টি নদীর জল বিষাক্ত। রাজ্যের ৪৭ শতাংশ পরিবারে টয়লেট নেই। বিচারাধীন বন্দির মৃত্যুতে গুজরাট দেশের মধ্যে প্রথম, আর টি আই(রাইট টু ইনফরমেশন) কর্মী খুনের ঘটনাতেও গুজরাট প্রথম। অথচ এই গুজরাটকে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' নামে কী প্রচারই না দিয়েছে। এদিনের সভায় নেতৃবৃন্দ মানবাধিকার আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর-এর উদ্যোগ

ক্ষুদিরামের জন্মবার্ষিকী পালন ও গ্রন্থ প্রকাশ

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে জয়নগর ও পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে শুরু করে রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, ক্রীড়া, শরীরচর্চা সমেত সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সুবিশাল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার একটা ইতিহাস 'হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর'-এর উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর জয়নগর-মজিলপুর টাউন হলে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮টি প্রবন্ধ ও বহু ঐতিহাসিক ছবি সংবলিত সুদৃশ্য এই গ্রন্থের নাম 'ঐতিহ্যমণ্ডিত জয়নগর— ইতিহাসের সন্ধানে'।

পুস্তকটি প্রকাশ করেন কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান চিত্ততোষ মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন সরোজরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম পরিষদের সম্পাদক)। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর-মজিলপুর পিপলস ব্যাঙ্ক, রূপ ও অরূপ, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা প্রভৃতি হেরিটেজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, জয়নগর ইন্সটিটিউশন, জে এম ট্রেনিং স্কুল, পি সি পাল স্কুল, শ্রী শ্রী সারদামনি বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পৌরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলার, বিধানসভার উচ্চশিক্ষা স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জীবন মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সরকার, প্রশান্ত সরখেল, রবীন্দ্রনাথ বসু, প্রীতীশ কর, কমিটির সভাপতি ভূতনাথ মুখার্জী ও সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর প্রমুখ। কানায় কানায় পূর্ণ টাউন হলে বিচারপতি মুখার্জী জয়নগরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে এই পুস্তক রচনার প্রয়াসকে স্বাগত জানান। সরোজরঞ্জন চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদী ধারার অন্যতম প্রতিভূ শহিদ কানাইলাল ভট্টাচার্য সমেত সকল বিপ্লবীদের অবদান আলোচনা করেন।

৩-৫ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরামের ১২৬-তম জন্মবার্ষিকী পালনের অঙ্গ হিসাবে উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর আগে ২৯ নভেম্বর ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর ক্ষুদিরামের জন্মদিনে বিকেলে ৩টায় এক সুবিশাল কেন্দ্রীয় পদযাত্রা জয়নগর-মজিলপুর শহর পরিক্রমা করে। সেখানে এলাকার বহু ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ৪ ডিসেম্বর বিভিন্ন এলাকায় শহিদ ক্ষুদিরাম সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org